নবমী

মঞ্জরী দে

'চিত্রলেখা'
শান্তিনিকেতন

উৎসর্গ

আমার ঠাকুরদাদা স্বর্গীয় কবি কুলচন্দ্র দে
ও ঠাকুরমা শ্রীযুক্তা পূর্ণশশী দেবীর শ্রীচরণে

২রা আষাঢ়, ১৩৫৯ মঞ্জরী

একটি কথা

এই লেখাগুলোর সবকটাই এখানকার পাঠ-ভবনে পড়বার সময় লেখা, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ পাঁচবছরের মধ্যে। তখন বিভিন্ন বিভাগীয় সাহিত্য সভায় এগুলির অধিকাংশই পঠিত হয়।

আমার বাবা ও মা'র উৎসাহেই এইক'টি লেখা একত্রিত হ'য়ে প্রথম বইএর আকারে প্রকাশিত হ'ল।

'চিত্রলেখা'
শান্তিনিকেতন
২রা আষাঢ় ১৩৫৯

মঞ্জরী দে

লেখার নাম

ভীম-বাঁধ

(মুঙ্গের)

শান্তিনিকেতন থেকে প্রায় প্রতি বারই পৌষ-মেলার পর এক-একটা দল এদিক-ওদিক এক্সকার্সনে যায়। এবারে পৌষ-মেলার পর একটা দল করে ভীম-বাঁধ যাবার ঠিক হ'ল। আমাদের দলে এবার রথীজ্যাঠামশায়, সুবীরকা,' সুরেনকা', বাবা এবং আরও অনেকে ছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে রাত ন'টার সময় আমরা রওনা হলাম। ট্রেনে আমাদের জন্য পাশাপাশি দু'খানা বগি রিজার্ভ করা ছিল। সেই ট্রেনে এখান থেকে আরও অনেকে এক্সকার্সনে

যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু ট্রেনে উঠে কারুর সঙ্গেই বিশেষ আর দেখা হলো না। দশটার সময় ট্রেন ছেড়ে দিল। ভোরবেলা ভাগলপুরে পৌঁছে আমরা চা খেলাম। আমি এদিকে বড় হওয়ার পর আর আসিনি, কাজেই সমস্ত দৃশ্যই আমার চোখে নতুন লাগতে লাগলো। ন'টার সময় আমরা বরিয়ারপুর স্টেশনে এসে নামলাম এবং বেলা বারোটার সময় বত্রিশ মাইল বাসে এসে ভীম-বাঁধ পৌঁছলাম। জায়গাটা দেখে খুবই ভালো লাগলো। ঠিক পাহাড়ের কোলেই আমাদের ঘাসের ঘর তৈরী করা হয়েছিল। মেয়েদের একটা ঘর, পুরুষদের একটা ঘর ও রথী জ্যাঠামশায়ের জন্য একটা আলাদা তাঁবু ফেলা হয়েছিল। রান্নাঘরও অবশ্য একটা ছিল। আমাদের ঘরের পিছনেই ছিল

একটা ছোট ঝরনা। এখানেই আমি প্রথম আবলুস ও খয়ের গাছ দেখলাম। প্রথম দিন আমরা ক্লান্ত ছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি খেয়েই শুতে গেলাম। পরের দিন ছিল নিউ ইয়ার্স ডে। দ্বিতীয় দিন আমরা ঠিক করলাম উষ্ণ-প্রস্রবণ দেখতে যাবো। সেদিন প্রথম জঙ্গলে বেরিয়েছি, কাজেই একটু ভয় করছিল। একটা গরম জলের নদী পেরিয়ে যেতে হয় ঐ প্রস্রবণে। নদীটা একটু চওড়া আর পেছল। তার ওপর আবার জলটা খুব গরম। মাঝে মাঝে পাথর দিয়ে যাবার রাস্তা করা আছে। আমরা নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে ক্রমশ প্রস্রবণের কাছে এসে গেলাম। যেখান থেকে গরমজল উঠছে সেখানে বলা হ'লো হাত দিয়ে পাথর তোলো। আমি

দু'তিনটে পাথর তুললাম। ফিরবার সময় রাস্তায় হরিণ ও ভাল্লুকের পায়ের ছাপ দেখা গেল। সবচেয়ে ভালো লাগতো ঐ জলে স্নান করতে। একে শীতকাল, তার উপর গরমজল! কাজেই দু'তিন ঘণ্টার আগে জল ছেড়ে কেউ আমরা উঠতাম না। দুপুরে যে জায়গাটায় আমরা বিশ্রাম করতাম সে জায়গাটা প্রাকৃতিক শোভার দিক থেকে খুব সুন্দর, কিন্তু সেখানে সব সময়েই একটা উগ্র মিষ্টি অথচ বিশ্রী গন্ধ আসতো। আমরা ভাবতুম, সেটা বুঝি কোনো পাতার গন্ধ। একদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরছি, এমন সময় একটা বড় নিমগাছের মতো গাছ নজরে পড়ল। গাছটার নিচের দিকের খানিকটা ছাল চাঁছা। ভাবলুম এই গাছটার গন্ধ শুঁকে দেখি, কিন্তু শোঁকবার আগেই নাকে এলো

টারপিনের গন্ধ। পথে যেতে যেতেই এই বিশ্রী গন্ধের গাছটা বার করলাম। যদিও সেটাকে ঠিক গাছ বলা যায় না, সেটা একরকম লতা। তার ফুল ফোটে, ফুলের যে আবার এমন অদ্ভুত গন্ধ হয় তা এর আগে জানতুম না।

আরও একটি মজার গাছ দেখেছিলাম ঐখানে। তার ছাল কাগজের মতো আর তার উপর লেখা যায়। আমি প্রথম লাক্ষার পোকাও দেখলাম এইখানে। একদিন পথ চলতে চলতে গাছের ডালে বাবুই পাখীর বাসার মতো ছোট ছোট ঝুড়ি ঝুলতে দেখে জিগেস করলাম সুরেনকাকাকে যে ওগুলো কি। তিনি বললেন, ওর মধ্যে তসরের গুটি আছে, পাছে পালিয়ে যায় সেইজন্যে স্থানীয় জংলী লোকেরা ওগুলোকে বন্ধ করে রেখেছে।

নবমী

এবার যেদিন আমরা আসল বাঁধটা দেখতে গেলাম সেই কথাই বলি। কথিত আছে পঞ্চপাণ্ডবদের অন্যতম ভীম্ নাকি এই বাঁধটা বাঁধতে আরম্ভ করেছিলেন, তারপর মাঝখানে বাধা পড়াতে অর্ধেকটা করে ছেড়ে দেন। আসলে ব্যাপারটা হ'ল একটা প্রকাণ্ড পাথর জলের মধ্যে অবস্থিত। এই জলাশয়টাই সমস্ত পাহাড়ের মধ্যে একমাত্র ঠাণ্ডা জলের উৎস। আরও দুটো ঠাণ্ডা জলের ডোবা আছে এইখানে, তবে দুটোই পাঁক ও পানায় ভরা। এইখানে প্রায়ই জন্তুরা জল খেতে আসে। জায়গাটা বেশ নিচু আর অন্ধকার। শুধু পশ্চিম দিকের পাহাড়টা একটু ঢালু বলে সূর্যাস্তের সময় আলো আসে। এই জায়গাটার একদিকে উঁচু পাহাড় এবং এই পাহাড়ে

ভীম-বাঁধ

শাল ও আবলুসের জঙ্গল। এখানে পাথরের গায়ে নানাজাতীয় ফার্ণ ও গাছের গায়ে নানা ধরণের অর্কিড জন্মায়।

এখানে রাত্তিরবেলা আমরা সকলেই আগুন জ্বালিয়ে তার চারিদিকে ঘিরে বসতাম আর গান গাইতাম। সকালে জঙ্গলে গিয়ে আবলুসের ছাল কেটে আনতাম, আর রাত্রে সেগুলোর আহুতি হ'ত আগুনে। আবলুসের ছাল আগুনে দিলে শিখা থেকে ফুলঝুরির মত সুন্দর ফুল্কি আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। শুনলাম আবলুস কাঠের কয়লা দিয়েই বাজীর মশলা তৈরী হয়।

ভোরে রথী জ্যাঠামশায়ের ব্রহ্ম-সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘুম ভেঙে যেতো. তারপর সূর্য উঠলেই তিনি কাঠের, আর বাবা পাথরের

সন্ধানে বেরুতেন। এই ভাবে তাঁরা প্রায় জঙ্গলের অর্ধেক কাঠ আর পাহাড়ের অর্ধেক পাথর এখানে বয়ে এনেছিলেন। বাবার পাথর কুড়োনো দেখে রঞ্জিৎদা' গান লিখেছিলেন ঃ

'পাথর রে তুই বড়ই ভাগ্যবান,
ছিলি প'ড়ে ভীম-বাঁধেতে
চল্‌লি কোথায় কার কাঁধেতে।
কলিকালের গন্ধমাদন বহন করে কে!'

মা আবার কবিতা লিখে তার উত্তর দিলেন। কবির লড়াই বেশ ভালই জমেছিল :

'রণজিৎ ভাই গেল কোথায়
তারে ডেকে নিয়ে আয়—
শিকারেতে গেল ধেয়ে
উৎসাহ সবার চেয়ে

যেন সাজিয়ে রেখেছে। সেখান থেকে সেদিন ফেরবার সময় খুব বৃষ্টি এল। আমরা গাংটায় বাঁটলি বাবুদের বাড়ী গেলাম। আমাদের সকলেরই ভয় ছিল ঘাসের ঘর নিশ্চয়ই সব ভিজে গেছে। তাই দেখতে বীরেনকা' গেলেন ও একটু পরে ফিরে এসে বল্‌লেন সব ঠিক আছে। আমরা ফিরে গেলাম। হঠাৎ মাঝ-রাতে চটাপট কান নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সকালে শুনলাম, কাল রাত্রে ভাল্লুকের দল এসেছিল। আসবার আগের দিন আমরা ওখানকার জংলী বাচ্চাদের খুব খাইয়ে-দাইয়ে আবার শান্তিনি-কেতনে ফিরে এলাম।

১৯৪৭

শান্তিনিকেতনে ছয় ঋতু

বৈতালিক শেষ হবার পর আর ক্লাশ আরম্ভ হবার আগে, অর্থাৎ ওয়ারনিং-এর ঘণ্টা পড়েছে অথচ ফাইন্যালের ঘণ্টা পড়েনি, এরকম সময় আমরা গ্রীষ্মের দিকটা ছায়ায় বসে আর শীতের দিকে রোদে বসে গল্প করি। বছরের প্রায় সব কটা মাসেই এই সময় পরচর্চা করি। কোনো ঋতু শেষ হয়ে যাবার পর আরেকটা ঋতু আরম্ভ হয়েছে কি হয়নি, তাই নিয়েও আলোচনা হয়।

সুপূর্ণা আগেই খবর দিয়েছিল যে, ওদের বাড়ির পলাশ গাছটাতে কুঁড়ি ধরেছে, কেকাও দেখাল একটা আম গাছে বোল ধরেছে। কাজেই বসন্ত কাল প্রায় এল বলে। ইতিমধ্যে আমিও

নবমী

দুটো কোকিল দেখেছি। কিন্তু সে দুটোর মধ্যে একটাও ডাকল না। একটা কোকিলকে দেখলাম ভারি মুশকিলে পড়েছে। সে কোকিলটা একটা কল্‌কে-ফুলের গাছের ডালে বসেছিল, আর ঘাড়ের রোঁয়াগুলো ফুলিয়ে এদিক ওদিক চাইছিল। আর নিশ্চয়ই ভাবছিল, বসন্ত কাল এসেছে কি আসেনি, গান গাইব কি গাইব না।

হেমন্তকালটা এখানে অন্যান্য জায়গার থেকে বেশ ভালোই বোঝা যায়। ধানগুলো পেকে যায়। কাশফুলও ঝরতে আরম্ভ করে। আর রাত্রিবেলা উত্তরদিক থেকে দলে দলে হাঁস উড়ে যায়। শীতকালও এখানকার খুব সুন্দর, শুধু ধুলোটা যা একটু বেশি হয়।

গ্রীষ্মকাল এখানে এত প্রচণ্ড যে বেশি

বুঝতে ইচ্ছে করে না। তাও আজকাল এখানে গরম কম পড়ে। দুপুরবেলা মাঝে মাঝে ঘুর্ণিবাতাস আসে। ঘুঘুর একটানা ডাক শুনলে আরও যেন গরম লাগে।

বর্ষাকালই এখানে সবচেয়ে সুন্দর। জ্যৈষ্ঠ-মাসের শেষের দিকে প্রায়ই পশ্চিম থেকে মেঘ করে আসে। বর্ষার প্রথমে মেঘের রঙটা বেশ ঘন নীল-কালো মতো থাকে, আর শ্রাবণের শেষে ভাদ্রের দিকে ক্রমশ ফিকে হয়ে ধোঁয়ার মতো হয়ে যায়। যখন মেঘ পশ্চিম দিক থেকে উঠে সমস্ত আকাশ-ময় ছড়িয়ে পড়ে, তখন পৃথিবীর উপর একটা ছায়া নামে। ঘাসপাতাগুলো তো সবুজই থাকে। তার উপর মেঘের ছায়া পড়ে আরও যেন সবুজ দেখায়। আর ঠাণ্ডা বাতাসে সেগুলো দুলতে থাকে। তার-

নবমী

পর বৃষ্টি ক্রমশ টপ্‌টপ্‌ থেকে ঝর্‌ঝর্‌ করে আরম্ভ হবার খানিক পরেই খোয়াই দিয়ে লাল মাটী-গোলা জল ছুটে যায়। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে থাকি। রাত্তিরবেলা চারিদিক বেশ ঠাণ্ডা থাকে। ব্যাঙেরা জলভরা ডোবায় অবিরাম ডাকে আর জোনাকিগুলো লণ্ঠনফুলের মধ্যে জ্বলে উঠে।

শরতে এখানে খুব ফাঁকা লাগে। রাত্তিরে আশ্রমের দিকে বেড়াতে এলে শিউলি আর ছাতিমের উগ্র মধুর গন্ধ পাওয়া যায়।

তারপরেই আসে শীত, আর সাতই-পৌষের মেলা। চেরা তালপাতা, ধুলো, পাঁপরভাজা, আর মিষ্টির গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। গোরুর গাড়ির ক্যাঁচর ম্যাচরের সঙ্গে যোগ দেয় নাগরদোলার ক্যাঁ কোঁ। সেই সঙ্গে তো আমাদের হুল্লোড় লেগেই

আছে। তারপর যাই এক্সকার্সনে। ফিরে এসে নতুন ক্লাশে। এমনি করে বছর কাটাতেই আর পরীক্ষা শেষ হলেই, আগের বছরের খোঁড়া নাগরদোলার খুঁটির গর্তের উপর সবেমাত্র গজানো ঘাসগুলিতে কোদালের কোপ পড়ে।

১৯৪৮

সন্ধ্যা

প্রতিদিনই সন্ধ্যা হয়। তাহারও অন্যান্য প্রহরের ন্যায় একটি নিজস্ব রূপ আছে এবং তাহা অতি অপূর্ব। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই, বিশেষত যাহারা শহরে থাকে, তাহারা সেই অপূর্ব রূপ দেখে নাই।

প্রভাতে সূর্য্য উদয় হয়। পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ে দিনের শেষে। প্রাতে বিহগগণ বাসা ছাড়িয়া উড়ে, সন্ধ্যায় তাহারা বাসায় ফেরে। ঊষায় পূর্বদিগন্ত রাঙা হয়, গোধূলিতে পশ্চিম প্রান্ত অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মিতে ভরিয়া যায়। আমি অনেক সময় সন্ধ্যাকে প্রভাত বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছি। অস্তমান সূর্য্যকে উদিত তপন

ভাবিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই তাহা ধারণা করিতে পারি নাই। তাহার প্রধান কারণ প্রাতে জড়তা কাটিয়া চতুর্দিকে একটা কর্মব্যস্ততা আসে। সন্ধ্যায় সব শান্ত হইয়া যায়।

সন্ধ্যার বহুবিধ রূপ আছে। শরতে স্বর্ণবর্ণের তরঙ্গ তুলিয়া সূর্য্য অতলে নামিয়া যায়। বহুক্ষণ ধরিয়া মেঘে মেঘে তাহার রশ্মি খেলিতে থাকে। জল স্থল স্বর্ণজ্যোতিতে প্লাবিত হইয়া যায়।

বর্ষাকালের অপরাহ্নে বৃষ্টির পর এক আশ্চর্য্য রাঙা আলোক আসিয়া পৃথিবীর উপর পড়ে। তাহা যাহারা না দেখিয়াছে সেই অদ্ভুত বর্ণ-প্লাবিত পৃথিবীর মূর্তি তাহারা কল্পনা করিতে পারিবেনা। তখন আকাশ, মাটি, জল, তরুশ্রেণী, সবই রক্তবর্ণ ধারণ করে। শীতকালেও প্রায়ই এরূপ সন্ধ্যা

দেখা যায়। তাহার আলোক ঈষৎ গৈরিকাভ। ইহা গোধূলি।

মাঝে মাঝে একপ্রকার শুভ্র আলোর উৎপত্তি হয় বৃষ্টির পর। তাহা বস্তুকে এতই উজ্জ্বল করিয়া তোলে যে শ্যামাঙ্গিনী কন্যাকেও নাকি গৌরবর্ণা দেখায়। তাই ইহার নাম হইয়াছে 'কনে-দেখানো আলো।'

মধ্যে মধ্যে দেখি সূর্য্যাস্তের সময় কোনো বর্ণ-মালার সৌন্দর্য নাই শুধু সূর্য্যকে একখানি থালার মতো দেখায়। তাহার সব লোহিত বর্ণটুকু যেন গড়াইয়া নীচে জমিয়াছে। ধূসর আকাশের মধ্য দিয়া সূর্য্য ডুবিয়া যায়। ইহা শীতের সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যা অতি মলিন। কিন্তু তাহাও ভালো লাগে। প্রান্তরের ওপারে, শ্রীনিকেতনের বাঁশবনের উপর

সন্ধ্যা

শীতসন্ধ্যার সূর্য্যাস্ত আমাদের অতি পরিচিত।

যেদিন ঘনবর্ষার ধারা ঝরে, আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, সন্ধ্যার অস্তিত্ব পশ্চিমপ্রান্তের দুটি-একটি স্বর্ণরেখার দ্বারাই আমাদের নিকট গোচর হয়।

'রক্তসন্ধ্যা' নামে একটি অদ্ভূত সন্ধ্যার কথা আমাদের দেশে শোনা যায়। রক্তবর্ণ দেখিলে যেমন মনে যুগপৎ ভীতি ও আনন্দের সঞ্চার হয়, তেমনি এই সন্ধ্যার ঘোর লোহিতবর্ণপ্লাবিত নভোমণ্ডল দেখিলে একই ভাবের উদয় হয়। যেদিন আকাশ পরিষ্কার থাকে, সেদিন পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্বপ্রান্ত অবধি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় রক্তসন্ধ্যার রশ্মি ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমশ ঔজ্জ্বল্য কমিয়া যায়। পশ্চিমপ্রান্তের লোহিতরাগ জ্বলিতে জ্বলিতে হঠাৎ নিভিয়া যায়।

নবমী

লোকে বলে, 'ঘরপোড়া গরুর রক্তসন্ধ্যা।' সন্ধ্যার নানা আলোক ও বর্ণ প্রভৃতি হইতেই নানা প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। সন্ধ্যা দেখিলেই গুরুদেবের এই কয়টি কথা আমার মনে হয় :

'ক্ষান্ত হও, ধীরে কথা কও। ওরে মন,
নত কর শির। দিবা হল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা এ বিশ্ব মন্দিরে
এল আরতির বেলা। ঐ শোনো বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্ত্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি। ধীরে নামাইয়া আনো
বিদ্রোহের উচ্চকণ্ঠ পূরবীর ম্লান-মন্দ স্বরে।'

১৯৪৯

ভারতের চিত্রকলা

বহুপ্রাচীন কাল থেকে নানাজাতি ভারতবর্ষে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করে দিয়েছে। তাই ভারতবর্ষের সভ্যতা তাদের দানে আজ সমৃদ্ধ। এদেশের চিত্রশিল্পের উপরেও নানা জাতির প্রভাব দেখা যায়।

মহেঞ্জোদাড়ো থেকে যে মৃন্ময়পাত্রগুলি উদ্ধার করা হয়েছে তার গায়ে সূক্ষ্ম আলপনার মতো চিত্র ও দু' তিন রকম রঙের ব্যবহার আছে।

এর অনেক পরে বৌদ্ধযুগে সুবিখ্যাত অজন্তা গুহার কাজ আরম্ভ হয়। বাঘ নামক গুহার কাজও এরই সমসাময়িক বলে ধরা হয়। অজন্তার কাজ গুপ্তযুগ পর্যন্ত চলতে থাকে। শেষের দিকের

নবমী

গুহাগুলি আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। গুপ্তযুগকে সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই সময়ে চৌষট্টি কলার অন্যান্য শাখার মতো চিত্রকলারও উন্নতি হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তির গৃহেই চিত্রশালা থাকত। আমাদের দেশের শিল্পীরা ছবিতে কখনও নিজের নাম লিখতেন না। তাই শিল্পীদের নাম আজও অজ্ঞাত।

এর পরে এল গুপ্তোত্তর যুগ। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে নানা বিখ্যাত অখ্যাত মন্দির নির্মিত হয়। এইসব মন্দির-গাত্রে ভিত্তিচিত্র ছিল। এখনও কিছু কিছু আছে। কিন্তু বেশির ভাগই কালের প্রভাবে ঝরে গেছে, বর্তমানে তার উপর চূন লেপে আধুনিক গ্রাম্য শিল্পীরা এলা আর গেরিমাটি দিয়ে আবার ছবি এঁকেছেন।

ভারতের চিত্রকলা

চিত্রকলার দিক দিয়ে পাঠানদের কিছু দান নেই। মুঘলরা আসার পর থেকে ছবি আঁকার কাজ আবার নবোদ্যমে শুরু হয়। সে আমলে মুঘল এবং রাজপুত উভয় রাজারাই চিত্রশিল্পের বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় দুইরকম অঙ্কনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করল। তাদের সাধারণত রাজপুত পেন্টিং ও মুঘল পেন্টিং নামে অভিহিত করা হয়। আগে সাদা জমি করে নিয়ে রং লাগানই এই পদ্ধতির বিশেষত্ব। প্রায়ই কবিতা, শ্লোক অথবা শিল্পীর নাম লেখা থাকত পাশে। মুঘল পেন্টিঙের বিষয় হল গাছ, লতা, ফুল, শিকার এবং আমির-ওমরা বাদশা বেগমদের প্রতিকৃতি। আর রাজপুত ছবিতে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক দৃশ্য আঁকা হত।

নবমী

জাহাঙ্গীর এবং শাহ্‌জাহানের সময় প্রচুর ছবি আঁকা হয়েছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেব কোনো শিল্পের প্রতিই বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না।

এর পর এলেন ইংরাজ। এঁদের নতুন কিছু দেবার মধ্যে হল অয়েলপেন্টিং। এই সময় বৈদেশিক রীতিতে অঙ্কিত প্রতিকৃতি এবং দৃশ্যাবলী ভারতীয় চিত্রকলায় স্থানলাভ করল।

বর্তমানে—গত ৫০ বৎসর যাবৎ চিত্রকলার যে যুগ চলছে তার স্রষ্টা আচার্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ।

আমাদের দেশে এসব ছাড়াও পট এবং অন্যান্য গ্রাম্য চিত্রশিল্প যথেষ্ট আছে। এর মধ্যে কালিঘাটের পটের নাম অনেকেই শুনেছেন। তাছাড়া উড়িষ্যার পট এবং দেবদেবীর ছবিও অনেক আছে। কিন্তু লোকশিল্পের কথা বিশদভাবে

ভারতের চিত্রকলা

বলতে গেলে প্রবন্ধ বড়ো হয়ে যাবে। নানা যুগের প্রখ্যাত চিত্রশিল্প সম্বন্ধে ব'লে এবং লোকশিল্পের কথা শুধু্ উল্লেখ করেই প্রবন্ধ শেষ করলাম।

১৯৫০

কাশীর গঙ্গা

রামনগরের এপারে যেখানে অড়হরের সবুজ ক্ষেত গঙ্গার বুকে গড়িয়ে পড়েছে সেখান থেকে মা-গঙ্গা সমানে উত্তরদিকে বয়ে চলেছেন। পলিমাটি পড়ে পড়ে সেখানকার জমি খুব উর্ব্বর, তাই সবুজে মোড়া তার মাটি। আখের ক্ষেত, তিসির ক্ষেত আর ছোলার ক্ষেত। হেমন্তের গঙ্গা, জল নেবে গেছে অনেকখানি, ওপারে বালীর চর দেখা যায়, দু-একটা গরু চরে সেখানে। রামনগরের দুর্গের উপর থেকে লাল টক্‌টকে আলো ছড়াতে ছড়াতে সূর্য্যদেব উঠে আসেন। দেখতে দেখতে এপারে সবুজের উপর সোণালী রং ধরে। নাগোয়ার ঘাটে দু-একটি সাধুসন্ন্যাসী আসতে

আরম্ভ করেছে। সকালের আলোয় মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ বহুদূরে আকাশের দিকে ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে পড়ে। বড় বড় ঘাটের বাঁধানো শানের উপর বৃদ্ধারা বসে থাকেন, বৃদ্ধব্রাহ্মণেরা গঙ্গাগর্ভে দাঁড়িয়ে সূর্য্যপূজা করেন। ক্রমে বেলা বাড়ে। পুরবধূরা দল বেঁধে আসে, স্নান করে, ঘাটের উপর গঙ্গামাটি দিয়ে শিব গ'ড়ে তার পূজা করে। ঝকঝকে ঘটি দিয়ে জল তুলে বাড়ী নিয়ে যায়। সারাদিনের কাজ আরম্ভ হয় তখন থেকেই। কোনো কোনো মা ছেলের হাত ধরে আসেন, শিশুকে পাড়ে বসিয়ে রেখে নিজে স্নান করেন, পূজা করেন, শিশুর পা চঞ্চল হয়ে ওঠে জলে নামবার জন্য। সাধুরা গঙ্গামাটি দিয়ে তিলক কাটে কপালে বুকে। গঙ্গার ওপরে যেসব বড়

নবমী

বড় বাড়ী আছে, তার জানালাগুলো খুলে যায়, ঘোমটার ফাঁকে তাকিয়ে থাকে উৎসুক চোখ, মেয়েরা চেয়ে চেয়ে দেখে ঘাটে লোকের আনাগোনা। নৌকাগুলো হেলতে দুলতে এগিয়ে যায় মাঝগঙ্গায়। পাষাণ ঘাটের মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ছাতার তলায় ভাগবৎপাঠ হয়। অনেক লোক জমে সেখানে, বিশেষ করে পড়ন্ত বেলায়, যখন অনেকগুলো নৌকা আরোহীদের নিয়ে গঙ্গার বুকে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। হরিশ্চন্দ্র ঘাটের ওপরে চিতার নীল ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে উঠতে থাকে। আবালবৃদ্ধবণিতার ভীড় হয় সে সময় ঘাটে। সারাদিনের কর্মক্লান্তি জুড়োতে আসে সবাই গঙ্গার তীরে। বৃদ্ধারা চাদর গায়ে দিয়ে বসে থাকেন শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সিঁড়ির উপর। ছোট

কাশীর গঙ্গা

ছেলেরা খেলা করে বাঁধা ঘাটে। কোনো বয়স্ক লোক নীচে গিয়ে গঙ্গার জল মাথায় ছিটোয়। ধীরে ধীরে সূর্য্য চলে পশ্চিম আকাশে। সমস্ত আকাশ, গঙ্গা, ওপারের চর রাঙিয়ে যায় সেই আলোয়। গঙ্গাতীরের বড় বড় থাম-দেওয়া পাথরের বাড়ীগুলোর দেওয়ালে দিনের শেষ আলো মিলিয়ে যায়। গোলাপায়রারা একে একে নৌকার হালে এসে বসে জল খায়, তারপর স্নান করে উড়ে যায় সেই প্রকাণ্ড বাড়ীগুলোর ছোট ছোট ঘুলঘুলিতে, বসে থাকে গলা ফুলিয়ে আলসের উপর। ক্রমে রাত্রির গাঢ় ছায়া ঘনায়। বাড়ী আর বালির সাদা চর মিশে যায় কালো অন্ধকারে। জানালায় জানালায় আলো জ্বালে মেয়েরা। তার ছায়া এসে পড়ে গঙ্গার বুকে। নৌকাগুলি আবার পাষাণ ঘাটে বাঁধা

পড়ে। দু-একটি বৃদ্ধা সিঁড়ির শেষধাপে বসে, প্রদীপ ভাসিয়ে দেন গঙ্গায়। দুলতে দুলতে প্রদীপ ভেসে যায়, প্রবাসী পুত্রের কল্যাণ কামনার বাতি জ্বালিয়ে। বিশ্বনাথের মন্দির থেকে আরতির ঘোরঘণ্টারব ভেসে আসে। চিতার ছাই, নশ্বর দেহাবশেষ, পূজার ফুল, আর কল্যাণ প্রদীপ নিয়ে বয়ে যায় পূণ্যসলিলা গঙ্গা। রাত্রির প্রহর বেড়ে যায়, মধ্যযামে ওপারের চরে শেয়াল ডেকে ওঠে, শ্মশানের আলো নিবে আসে; যখন অন্ধকার বাড়ীগুলির ওপর থেকে অনেক রাত্রের হলুদ চাঁদ দেখা দেয়, যখন সমস্ত জগৎ নিশুতি, কেবল গঙ্গা বয়ে যায় অন্ধকারের মধ্যে তার অনন্ত যাত্রায়, সাগরের উদ্দেশ্যে।

১৯৫০

শাড়ী

মেয়েদের মধ্যে সাজবার ইচ্ছাটা প্রকৃতিদত্ত। সেই আদ্যি কালে যবে থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, তখন থেকেই মেয়েরা সাজছে লতা পাতা ফুল দিয়ে, হাড় কড়ি আর ধাতুর অলঙ্কার দিয়ে। কালে কালে সেগুলি উন্নতির পথে যাচ্ছে, মানুষের রুচি অনুসারে দেশবিশেষে তার আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ক্রমশ তা' সংস্কৃতির মধ্যে স্থান পেয়েছে। চৌষট্টি কলার মধ্যে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করাকেও একটি কলা হিসাবে ধরা হয়। নিজেকে সুন্দর করবার ইচ্ছা এবং সুন্দরকে দেখে খুসী হওয়া জীবজগতের স্বভাব। এর থেকেই সমস্ত সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি।

নবমী

মেয়েরা নানারকমে নিজেদের সৌন্দর্য বর্দ্ধন করে থাকেন। অঙ্গরাগ, অলঙ্কার, সুন্দর বসন তাঁদের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের সহায়ক হয়। তার মধ্যে বেশের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করছি।

এখনকার মেয়েরা আর প্রাচীনাদের মতো গৃহের পরিধির মধ্যেই দিন কাটান না, নানা কারণে তাঁরাও বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। অনেক কাজে তাঁদের ঘুরতে হয়। অনেকেই স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করছেন, শিক্ষয়িত্রী, কর্মচারিণী এবং আরও নানারূপ কাজ ক'রে। আমাদের দেশের মেয়েরা অনেকেই এইরকম কাজে নেমেছেন। বাংলার মেয়েদের পরিধেয় শাড়ী, আপামর সাধারণ সকল স্ত্রীলোকেই পরেন। অবশ্য পরবার

ধরণ এক নয়। সাধারণত ভদ্রগৃহের মেয়েরা যে ভাবে শাড়ী পরেন, তাকে 'হাব্‌ল্‌' করে পরা বলে। শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিণী দেবী এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। এইরকম পরবার ধরণ খুবই ভদ্র এবং সুরুচির পরিচায়ক। এর আগে খানিকটা পার্শী ফ্যাশনে শাড়ী পরার প্রথা ছিল তার নাম 'স্কার্ট' ফ্যাশন। শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী এই ধরণে কাপড় পরার প্রচলন করেন। তখনকার দিনের ব্রাহ্মসমাজের মহিলারা full sleeve blouse আর skirt ফ্যাশনে কাপড় পরতেন। এই রকম পরায় সামনে আঁচল থাকে। 'হাব্‌ল্‌' করে কাপড় আমরা পরি। সামনে কোঁচা ঝোলানর প্রথাটি পশ্চিম থেকে এসেছে। কিন্তু এইরকমে কাপড় পরা সব সময়ে চলতে পারেনা,

নবমী

যেমন দৌড় ঝাঁপের কাজে। সেদিক থেকে শাড়ী হ'লেও মাদ্রাজী রমণীর মতো কাছা দিয়ে পরা অনেক সুবিধাজনক। অবশ্য ১৮ হাতী শাড়ী বাংলার তাঁতীরা বোনেনা। যাক সে কথা, এখন দেখা যাক কোথায় কী রকম বেশ হওয়া উচিত। সাধারণত তিন যায়গায় মেয়েদের গতিবিধি, সামাজিক ক্রিয়া কর্মে, কর্মক্ষেত্রে, এবং গৃহাঙ্গনে। সকাল বেলার কাজ গৃহ থেকেই সুরু হয় সুতরাং তার কথাই আগে বলা উচিত। এককথায় নিজ গৃহে যেমন খুসী চলতে পারে, যার যেমন অভিরুচি। অবশ্য সর্বদা পরিষ্কার থাকাই শ্রেয়। এরপর আসে কর্মজীবন, এখানে বসন সংযত হওয়া আবশ্যক। কারণ নানারকম কাজে সকলকে ব্যাপৃত থাকতে হয়। বেশ যতটা সম্ভব গুছিয়ে গাছিয়ে পরে থাকতে হয়।

শাড়ী

আজকাল সালোয়ার পাঞ্জাবী অনেকেই পরেন, কর্মজীবনের পক্ষে এই বেশই উপযোগী। কর্মজীবনে দেশের বিশিষ্টতা বজায় রাখার কিছুমাত্র দরকার নেই। কাজ হলেই হ'ল। কিন্তু আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রের কোন নির্দ্দিষ্ট বেশ আজও হয় নাই। আশাকরি সমাজ নেত্রীরা শীঘ্রই এর একটা ব্যবস্থা করবেন।

তারপর আসে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মের বেশ। সামাজিক ক্রিয়া যথা বিবাহ, পূজা, উপনয়ন, ইত্যাদি। এইগুলিতে রুচির মাত্রা রেখে যতখুসী সাজা যেতে পারে। কারণ এই সকল ক্ষেত্রেই মেয়েরা বেশভূষায় সুরুচির পরিচয় দেবার সুযোগ পান। কোনো বিবাহাদির তিনদিন আগেই সজ্জানুরাগিনী কি পরবেন ভাবতে থাকেন, এবং সজ্জা সম্বন্ধে

নবমী

উদাসিনীরা সেই রাত্রেই মা মাসী প্রভৃতি গুরুজন স্থানীয়াদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে অবশেষে চোখফুলিয়ে তাঁদেরই নির্বাচিত একটা শাড়ী পরে বিবাহ সভায় গিয়ে বসেন। এবং যাঁরা মধ্যমা তাঁরা মধ্যম রকম সাজসজ্জা করে সজ্জানুরাগিনীকে জিজ্ঞেস করেন এই শাড়ীটার কথাই বুঝি বলছিলি? আর আরক্তনয়না উদাসিনীর কাছে গিয়ে বলেন, কাঁদছিস কেন ভাই, তোকে খুব সুন্দর লাগছে। বলা বাহুল্য একজনের কাছ থেকে লাভ হয় সুমিষ্ট হাসি, আরেকজনে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করেন।

সামাজিক ছাড়াও আর একটি দিক আছে যেমন কোনো জায়গা দেখতে যাওয়া বা বেড়াতে যাওয়া। সেখানেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে অল্প

সাজাই ভালো। সেদিন যেমন এক ভদ্রমহিলাকে দেখলাম বেণারসী পরে গ্রন্থাগার দেখছেন। ষ্টেশনে কিছুক্ষণ বসলেই এটা বেশ চোখে পড়ে। ভালো ভালো শাড়ীমোড়া নারীবাহিনী চলেছেন। তাঁরা বোঝেননা যে বাইরের জগতে বিশেষ করে যেখানে ট্রেনে ওঠা, কয়লা প্রভৃতি লাগার ভয় সেখানে যথাসম্ভব সরল বেশই উপযোগী।

মোটামুটী ভাবে আমার কথা শেষ হয়ে এলো। এইবার শাড়ী সম্বন্ধে কিছু বলেই শেষ করব। শাড়ী নির্বাচনের দিক দিয়ে ভারতীয় শাড়ী পরাই সকলের উচিত। আমাদের দেশে ভালো শাড়ীর কিছুমাত্র অভাব নেই, বেণারসী অথবা মাদুরার রেশমী শাড়ী ছেড়ে আমেরিকান সিল্কের Rayon অথবা Nylon পরলে একটুও সম্মান বাড়ে

না। বরঞ্চ দেশের তৈরী জিনিষ পরায় সুরুচি, স্বদেশপ্রীতি এবং শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি অবশ্য সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ব্যবহার করা যায়। সাধারণ জীবনে তাঁতের কাপড় পরাই উচিত। নিজের দেশের তাঁতীদের তাতে সুবিধা হয়। তাঁতের কাপড়ের এমন একটা বিশেষ মর্যাদা আছে যা মিলের কাপড় শত পাতলা এবং সুন্দর হলেও তাকে দেওয়া যায় না। বর্ত্তমানে অনেকেই পাড়বিহীন শাড়ী পরেন, কিন্তু তাঁরা যেন ভুলে না যান যে পাড়ের এমন একটা শ্রী আছে, যা খুব চোখে লাগা সুন্দর রঙের পাড়বিহীন অত্যাধুনিক শাড়ীতেও পাওয়া যাবে না। একটী অতি সাধারণ সাদা শাড়ী শুধু পাড়ের জন্যই শ্রী সংযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। আবার অনেক সময়

শাড়ী

দেখা যায় যে মেয়েরা নানা রকম রঙের শাড়ী পরেছেন, তাঁকে মানায় কিনা না ভেবেই। তাঁরা ভাবেন যে তাঁদের খুব সুন্দর লাগছে। কিন্তু অপরের চোখে তা বিসদৃশ লাগে। কারণ তাঁদের গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে পরার দিকে তাঁদের লক্ষ্য থাকে না। এবার আমার কথা শেষ হয়ে এলো। আশা করি ধীরে ধীরে বাংলার মেয়েরা সময়োপযোগী বেশধারণ করতে শিখবেন এবং নিজের দেশে বোনা শাড়ীর প্রতি অনুরাগিণী হবেন।

১৯৫০

বন্ধু

পড়াশোনা শেষ করে খেতে যাবো তখন, আশ্রমের দিক থেকে খাবার ঘণ্টার টঙাটঙ আওয়াজ ভেসে আসছে। জানলাটা বন্ধ করতে গেলাম, কাজ সেরে রাখাই ভালো নইলে আবার ঘুমচোখে এসে বন্ধ করতে হবে ; পাল্লাটা টেনে তার ওপরের লতাটা ছাড়াচ্ছি, এমন সময় চোখে পড়ল একটা সুন্দর সাদা গিরগিটি। লতাটা আমারই লাগানো। বেশ বড় হয়ে উঠেছে বৃষ্টির জল আর রোদ পেয়ে। কয়েকটা ডাল জানলার কাছে ঝোলে, কার্নিস বেয়ে উঠেছে সেখানে। রোজ সকালবেলায় নুতন আলোতে যখন থোকা থোকা বেগুনী ফুল ফোটে, তখন যে কী আনন্দ হয় আমার! সেদিন রাত্রে

বন্ধু

আকাশ পরিষ্কার—মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। তারা ফুটেছে আকাশময়। মৃদু বাতাসে লতাটা দোল খাচ্ছিল, আর সেই লতায় শুয়ে সেই অপরূপ সুন্দর গিরগিটি। মহাআরামে এক চোখ বুঁজে এক চোখ খুলে চেয়ে আছে, আর মিটিমিটি হাসছে। ঠাট্টা করছিনা, গিরগিটিও সুন্দর হয়, অপূর্ব সুন্দর, কী চমৎকার তার দেহভঙ্গী, কেমন অভিজাত কায়দায় সে যে দোল খাচ্ছিল লতা আঁকড়ে, যে না দেখেছে চোখ মেলে সে বুঝবে না। আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেলাম, যেমন মুগ্ধ হয় লোকে একটা সুন্দর প্রজাপতি বা ফুল দেখে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তার দিকে ; হঠাৎ মনে হল এর একটা ছবি এঁকে ফেল্‌লে হয়। তখুনি কালোরং দিয়ে সাদা কাগজে তার সেই সুন্দর পিঠের আঁকা-

নবমী

বাঁকা ভঙ্গীটার রূপ দিতে চেষ্টা করলাম। অনেক ছবি আঁকার পর একটা হ'ল। তাও যেন তার সব সৌন্দর্যটা তাতে ধরা পড়লনা। সেদিনকার মতো খেতে চলে গেলাম। পরদিন সন্ধ্যা না হতেই উদ্বিগ্নভাবে লতাটার দিকে চেয়ে রইলাম। কেবলি মনে হতে লাগল যদি ও না আসে? হয়তো আজ আর ও আসবেনা। তার আসার আগেই বাইরে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল, মাষ্টারমশাই আসছেন। বইটই গুছিয়ে নিয়ে ঠিক হয়ে বসলাম। পড়া যখন মাঝামাঝি তখন হঠাৎ চোখ পড়ল জানলার দিকে, অত্যন্ত স্বস্তি আর আনন্দের সঙ্গে দেখলাম আজও সে এসেছে। ভাবলাম মাষ্টার মশাইকে এই সুন্দর দৃশ্যটা দেখাই। তারপরেই মনে হ'ল না বাবা

কাজ নেই। হয়তো বকুনি দেবেন, বলবেন কেবল বাইরের দিকে মন। সেদিন থেকে রোজই সে আসে। এসে আমার পড়া শোনে আর হয়তো মনে মনে হাসে। মাঝে মাঝে বাহ্‌মনী আর বিজয়নগরের খিটিমিটি পড়তে গিয়ে মন চলে যায় লতার দিকে, যেখানে সে দোল খাচ্ছে আপন মনে, পরমসুখে। তৎপুরুষ আর অব্যয়ীভাব বুঝতে না পেরে গভীর দুঃখের সঙ্গে মনে হয়, আহা আমি যদি গিরগিটি হতাম, তো মনের সুখে লতায় দোল খেতাম। আর গিরগিটি হয়তো ভাবে, আমি যদি মানুষ··· ···

যাক্ গে, সে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর কী হবে? ভগবান যাকে যা' করেছেন তার তাই ভালো। আর মানুষ হয়েও তো তার সঙ্গে ভাব

নবমী

হয়ে গেছে। সে রোজ আসে, দোল খায়, আর চুপ করে পড়া শোনে। আমাকে সে আর ভয় পায়না, হাত তালি দিলে, বা জানলা বন্ধ করতে গেলে পালিয়ে যায় না। তাকে না দেখলে আমার মন খারাপ হ'য়ে যায়। তারও হয়তো হয়, কে জানে!

১৯৫১

উপেক্ষিত প্রতিবেশী

এমন একটা বিষয় নিয়ে লিখতে বসেছি, শুনে সবাই কি ভাববেন কে জানে। সম্পাদিকার তাড়া আছে, 'মনে থাকে যেন আজই লেখা চাই।' মহা ভাবনা, একটা লিখছিলাম বটে, কিন্তু সেটা বেশ ভেবেচিন্তে লিখতে হচ্ছিল। শুয়ে শুয়ে ভাবছি, ক্লাশের তো সময় হয়ে এল, এমন সময় ওমা! ওটা কে? বাবা আর মার একএক পাটী চটীর পিছনে! ছোট্ট খাট্ট, কেমন জিলজিলে চোখ আর দুটি ছোট ছোট কাণ। কালও এসেছিল, ঠিক এই সময়ে, এই বাচ্চাটাই. মনে মনে বলি—বাঃ বেশ সময়ের জ্ঞান আছে তো! কিন্তু এখানে কেন? খাবার ঘরের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেনা বোধহয়। বেশ ভাল লাগল

নবমী

দেখে, মনে হল—কেন? ভাবনা কিসের? এদের নিয়ে লিখলেই তো হয়।

আচ্ছা, কুকুর তো আপনারা হামেশাই দেখছেন, কিন্তু তাদের হাসতে দেখেছেন কি? আপনারা বলবেন, আমরা তো তোমার মতো পাগল হইনি, যে কুকুরের হাসি দেখে দেখে বেড়াব। কিন্তু হাসি নয়, কুকুরে সত্যিই হাসে, অবশ্য শুধু তাদের কাছেই, যারা তাদের ভালবাসে। বেশ বোঝা যায় ঠোঁটের একপাশে তারা হাসছে। কোনো রকম দোষ করলে চোখ দুটো তাদের জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। বেশীর ভাগ কুকুরেরই হাব-ভাব আর চেহারা দেখে তাদের প্রকৃতি বোঝা যায়। আজই তো ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় দেখি এক কুকুর মেহেদি বেড়ার পিছন থেকে লম্বাপানা মুখ

করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, দেখেই বোধ হল তার মাথায় যেন কোনও ফন্দি খেলছে, ঠিক দুষ্টুবুদ্ধি খোকার মতো। অনেক কুকুরকে দেখলে মনে হয় কেমন উদাসী উদাসী ভাব, যেন কোনো কবি। আপনারা আবার কেউ চটে যাবেন না কিন্তু। এক-একটা কুকুর আছে যারা দেখলেই কাঁইকুঁই করে আদর চায়, এদের দেখলেই হাসি পায়, বিশেষ করে ক্লাসের সময়। আবার কোনো কুকুর ক্লাসের মাঝ দিয়ে হেঁটে গেলে সমস্ত ক্লাসটা চুপ মেরে যায়; এমনই রাজসিক চাল তাদের। কুকুররা মানুষ দেখেই বোঝে কে তাদের ভালবাসে, আর কে বাসেনা, যারা বাসেনা তাদের কাছে তারা একেবারেই ঘেঁসে না। আমায় রাস্তায় দেখলেই তো দলে দলে কুকুর আপনি চলে আসে, আর

তখনই বন্ধুরা বলে, 'এই বুক্‌লু তুই তোর কুকুর নিয়েই থাক, আমরা চললাম।'

কুকুর আর বাঁদরের খেলা দেখেছেন কখনও? আমরা সেদিন দেখলাম,—তখন একটা ক্লাস ছিল, সেইজন্যই বোধহয় মনটা সেদিকে গিয়েছিল বেশী। গাছের ওপর বাঁদর আর তলায় কুকুর। বাঁদররা তাদের ল্যাজ ঝুলিয়ে দিচ্ছিল আর কুকুররা সেগুলো ধরতে গিয়ে কেবলই আছাড় খাচ্ছিল। তবু কুকুর গুলোর শান্তি নেই। মুখ ওপরে করে গাছতলায় বসে ছিল যেন তাদের ধ্যান ধারনা সবই ঐ বাঁদরের ল্যাজ। আমাদের খুবই হাসি পাচ্ছিল, যদিও বকুনির ভয়ে বেশী হাসতে পারছিলুম না। আমাদেরও মনপ্রাণ সব পড়েছিল ঐ খেলার দিকে।

কোন্ পাখী সবচেয়ে ঝগড়াটে বলুন তো?

শালিখ পাখী। এমন গণ্ডগোলে পাখী তুনিয়ায় আর তুটি নেই। কেবলি কঁ্যাচোম্যাচো, টঙ্ক টঙ্ক; কোঁ কোঁ। আর সব সময়েই ব্যস্ত। আমার তো ওদের ডাক শুনলেই মনে হয় যেন ঠাট্টা করছে। শালিখরা প্রথম দেখা হলেই তাল ঠোকে তারপর ঝগড়া করে,আর তার পরেই মাথা নোয়ানুয়ি করে মিটমাট করে ফেলে। ইংরিজি ক্লাসে প্রায়ই দেখি কার্নিসে বসে শালিখপাখী পালক ঝাড়ছে, গা চুলকোচ্ছে আর ডানা ঝাড়ছে। এসব ঠিকঠাক হওয়ার কারণ কিন্তু হচ্ছে ঝগড়া করা।

আবার ঠিক এর উলটো জাতের এক পাখী আছে। ভাবসাব করে মিলেমিশে থাকাই যেন তাদের প্রধান কাজ। তাঁরা হলেন পায়রা। এদের গলাফোলানো, গদগদ ডাক শুনলেই মনে হয় যেন

নবমী

কোনো আহ্লাদী মেয়ে। দুলে দুলে কার্নিসে কার্নিসে হেঁটে যায়, যেন পয়মন্ত লোকের মোটা-সোটা গিন্নীটি। দুপুরবেলাটা হয়তো একটা গল্পের বই নিয়ে ওপরে শুতে গেলাম অমনি মশারির চালে বসে ডাকাডাকি সুরু করে দেবে 'ও বুকুমা, বুকুম্ কুম্, খেতে দাও গো কলাই ধান।' মাঝে মাঝে রাগও হয়, দুত্তোর ছাই, তোদের জন্য আবার নীচে ছুটতে হবে কলাই আনতে। কিন্তু ওদের দিকে তাকিয়েই রাগটাগ সব উড়ে যায়। নীচে দৌড়ই খাবার আনতে। পায়রার সঙ্গে আমার একটা খুব নিকট সম্পর্ক বার করে ভাইটা তো আমাকে 'বুকুম্ কুম্' বলেই ডাকতে সুরু করে দিয়েছে। এদের জ্বালায় দিদি হওয়াটাও মাঠে মারা গেল।

উপেক্ষিত প্রতিবেশী

আমাদের বাড়ীরগুলো সাদা পায়রা। নীলগুলো থাকে সায়েন্স-রুমের ঘুলঘুলির ফাঁকে ফাঁকে। ক্লাস করতে করতে হঠাৎ শোনা যায় পাখা ঝাপ্‌টানির শব্দ, গোলা পায়রা আকাশে উড়ে গেল নীল ডানা মেলে, সূর্যের আলোয় তাতে সাত রঙের ঝল্‌মলানি খেলে যায়, পা দুটি যেন আলতা পরানো। মেঘলা দিনে পায়রারা কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকে, কিন্তু রোদের দিনে তাদের আনন্দ দেখে কে?

আরেকটা বড় সুন্দর জীব আছে, যাকে নিয়ে এ লেখার আরম্ভ, সে হল ইঁদুর ছানা। এত সুন্দর কুচ্‌কুচে কাল চোখ, একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। ছুটে ছুটে চলে আসে রুটীর টুকরো পড়তে দেখলেই। খাঁচায় বন্ধ ইঁদুরের বাইরে

আসার জন্য হাতজোড় করা দেখলে যদি চোখে জল না আসে তো কি বলেছি।

একটা কথা, এদের না ভালবাসলে কিন্তু এদের সৌন্দর্য্য দেখতে পাবেননা। এরা আমাদের এত কাছে থাকে তবু আমরা চোখ মেলে দেখিনা এদের। অথচ কত সুন্দর জিনিষই দেখা যায়, দেখবার ইচ্ছা থাকলে।

১৯৫১

খোয়াই

ছোটবেলার যেসব কথা মনের উপর ভেসে আসে খোয়াই তার মধ্যে একটা। সেদিন জানতাম শান্তিনিকেতন বলে এক জায়গা আছে। সেখানে আছে আমাদের খড়েছাওয়া বাড়ি, আর অনেক ভাইবোন। আর আছে লাল-রঙা নুড়ি-ছড়ানো খোয়াই। সেইটাই ছিল সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

এখানকার সম্বন্ধে যা' কিছু মনে আছে তা হল দুটি জিনিস,—মনে আছে একদিন মা'র হাত ধরে কোথায় যেন অনেক দূরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাদের ঢুকতে হয়েছিল গাছে-ঢাকা মস্ত বড় একটা গেটের ভিতর দিয়ে। সেদিন বাড়ি থেকে গেট পর্যন্ত হাঁটতে খুব দূর মনে হয়েছিল। পরে

নবমী

প্রথম যেদিন এখানকার স্কুলে ভর্তি হলাম সেদিন আবার গেটটা দেখি, সেটা আমাদের মন্দিরের পাশের গেট।···আর মনে পড়ে ভোরবেলা, আমরা সব ভাইবোন, মা আর পিসিমার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি—একটা খেজুরতলার উদ্দেশ্যে। মাঝে মাঝে জলের ধারা, রঙবেরঙের নুড়ি, আমরা সেগুলো মনের আনন্দে কুড়োতে কুড়োতে চলেছি। সে খেজুর গাছের এখন আর চিহ্নও নেই, পাথর-গুলোও সব যেন কোথায় চলে গেছে।

এ আমার একেবারে ছোটবেলাকার কথা। তারপর আরও বড় হয়ে আসি এখানে। তখন উদীচীতে 'শিশুরঞ্জনী' বলে এক পাঠশালায় চলত আমাদের পড়াশোনা। রোজ উত্তরায়ণের ছোট গেট দিয়ে বাড়ি ফিরতাম ; খোয়াই আরও চেনা

হয়ে উঠল আমার কাছে। দুপুরবেলা দোতলার জানলায় বসে দেখতাম খোয়াইএর বুকে লাল ধুলোর ঝড় উঠেছে। তালগাছের মাথা কাঁপছে ঝোড়ো হাওয়ায়। কখনো বা আমাদের বাড়ি থেকে রোদে-মেলা জামাকাপড় উড়িয়ে নিয়ে যেত এই ঝড়। তখন তো এদিকে এত গাছপালা ছিল না।

এরপর ভর্তি হলাম পাঠভবনে, স্থায়ীভাবে। ছ'দিন টানা স্কুল করতে হয়, বুধবার ছুটি। সেই ছুটি কী করে কাটানো যায়? আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত মানিক আর ভানু দুই ভাই। তাদের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। ঠিক হল খোয়াইএর হ্রদে আর নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া হবে। এখানে 'হ্রদ' ব্যাপারটাকে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

এখন যেখান দিয়ে ভকতভাই এর রাস্তা গেছে সেখানে ছিল একটা নাবাল জায়গা। বর্ষায় জল জমত সেখানে, গড়িয়ে চলে যেত একেবারে ঢাল বেয়ে সোজা পূর্বদিকে। তারপর মাঠের সব জল জমা হয়ে বয়ে যেত উত্তরে, তালতোড়ের দিকে। বর্ষায় আমাদের এই নদীতে চলে আসত ছোট ছোট মাছ,—খানিক দূর গেলে কইমাছও পাওয়া যেত। কিন্তু ঐ নাবাল জায়গায় হ্রদটাই ছিল আমাদের প্রধান ঘাঁটি। তখন বর্ষাকাল,—গামছা আর তোয়ালে নিয়ে আমরা জলে ছপছপ করতে করতে সোজা চলে যেতাম মাছের সন্ধানে। মাছ অবশ্য আসত না আমাদের সঙ্গে, আসত নানারকম পাথর। কতরকম নাম তার—কাঠপাথর, মিছরি-পাথর, বেগনিপাথর। মিছরিপাথরের উপর

সবারই টানটা ছিল বেশি, যদিও সেটা খাওয়া যায় না।

তারপর একসময় চলে গেল মানিক ভানু। দিনকতক বন্ধ থাকল আমার মাছ-ধরা। খোয়াইএ হামেশা যাওয়াও বন্ধ হয়ে এল। শুধু মাঝে মাঝে যখন ক্লাসের বন্ধুরা আসত তখন বেড়াতে যেতাম খোয়াইএ। তখন একটিমাত্র বাড়ি হয়েছে পূর্ব-পল্লীতে,—ঐ চালাবাড়িটা। সেটাকেই খুব দূর মনে হত। একবার স্কুলের বনভোজন হল সেখানে।

এরপর আমাদের পাশের বাড়িতে এল দুই বোন—রঞ্জিতা আর বন্দিতা। খুব ভাব হল তাদের সঙ্গে। আবার শুরু হল আমাদের মাছ ধরা। এবার আরেকটা নতুন জিনিস আবিষ্কার

করা গেল,—একটা বৈঁচিগাছ। খুব ফল ধরত তাতে। সুমিতি আর আমি প্রায়ই বৈঁচি খেতাম মনে আছে। খোয়াই ছিল বুনো কাঁটাকুলের ঝোপে ভরা। সুমিতিদের বাড়ি থেকে দৌড়ে আসতে একশোবার উপরনিচ করতে হত ঢেউ-খেলানো খোয়াইএ। খোয়াইএর একধারে সুধীরদার বাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল চারটে ভাঙা দেওয়াল, কোন্ এক খোড়ো বাড়ির ভাঙা ভিত্। সেখানে ছিল শরগাছের জঙ্গল, আমি আর আমার এক বন্ধু উঁচু ঢিপিতে বসে প্রায়ই অনর্গল গল্প করে যেতাম। আজও একটা আতাগাছের ঝোপ দেখা যায়, 'গুর্জরী' বাড়িটার পিছনে,—সেখানে থাকত আমাদের কল্পনার বুড়োবুড়ি। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োবুড়ি

গেছে মিলিয়ে। আর সে বন্ধুর তো আজ মনেও পড়বে না সে-কথা।

আমাদের সমস্ত আনন্দ আর কৌতূহলের জায়গা ছিল এই খোয়াই। এ কখনো পুরোনো হত না আমাদের কাছে। সেবার এক গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা অনেকে আছি এখানে। খোলা হল মণি-মেলা। আমরা রোজ খেলতে যাই, সুমিতিদের বাড়ির সামনের মাঠে। দারুণ ধুলোর ঝড় তুলে ঘনঘটা করে মেঘ আসে; আমাদের খেলা চলে পূর্ণোদ্যমে। তখন দুটি একটি বাড়ি উঠছে মাঠে। এখানে ওখানে কুয়োখোঁড়ার ঢিবি। আমরা খোয়াইএ লুকোচুরি খেলছি। একটা বড় বাড়ির ভিত খোঁড়া হচ্ছে। তারই জমানো মাটি জলে ধুয়ে এসে ক্রমশ ঢেকে দিচ্ছে খোয়াইএর

ঢাল। হঠাৎ কে যেন বলে ওঠে, দেখ দেখ, খোয়াই ঢেকে যাচ্ছে। হঠাৎ সবাই থমকে দাঁড়িয়ে যায়। তাইতো খোয়াই চাপা পড়ে যাবে নাকি? খানিক স্তব্ধতার পর আবার খেলা শুরু হয়। কিন্তু খোয়াই কি সত্যিই ঢেকে যাবে?

যে বাড়িগুলো তৈরি হচ্ছিল সেগুলো শেষ হয়ে যায়। নতুন নতুন বাড়িতে উঠে আসে নতুন সব লোক। আরও কত বাড়ি ওঠে। 'ওঠে' বললে বোধ হয় ঠিক হবে না, 'গজায়' বলাই ভালো। ব্যাঙের ছাতার মতো বাড়ি গজাতে শুরু করে—এখানে ওখানে সেখানে। শুক্‌নো খোয়াই হয়ে ওঠে বাগানে ভরা; রাশি রাশি রঙিন ফুল ফুটে ওঠে সে বাগানে। যে খোয়াইএ ঘাস গজানো দুষ্কর ছিল সেখানে হয়ে উঠছে বাগান।

খোয়াই

আজ কেউ কল্পনাও করতেও পারবে না দশ বছর আগে, অতও নয়, মাত্র পাঁচছ’বছর আগে এই খোয়াইএর কী রূপ ছিল। এখন আর কোনো ছোট বাচ্চাকে খেলতে দেখি না খোয়াইএ। আর খেলবেই বা কোথায়। সবই তো লোহার বেড়ায় বন্দী। অবশ্য সুন্দর হচ্ছে খুবই, আরও কত হবে। বাড়ি আর বাগানে অনেক বেড়ে উঠবে আমাদের শান্তিনিকেতন। ওদিক থেকে খালের জল এসে কাঁকুরে খোয়াইকে ভরিয়ে দেবে ঘাসে। কিন্তু আমাদের পুরোনো খোয়াই যে হারিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য কষ্ট হয় না কারুর ?

১৯৫১